মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ

ফাহমিদ-উর-রহমান

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

এক

মোহাম্মদ হামিদুল্লাহকে বলা হতো স্বাধীন হায়দারাবাদের শেষ নাগরিক।[১] ১৯৪৮ সালে স্বাধীন হায়দারাবাদ রাষ্ট্র গায়ের জোরে ভারত দখল করে নেয়। সেই থেকে মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ একজন রাষ্ট্রবিহীন ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং আমৃত্যু তিনি পাসপোর্টবিহীন অবস্থায় রাজনৈতিক মুহাজির (Political Refugee) হিসেবে কাটিয়ে দেন। হায়দারাবাদের অবলুপ্তির পর তিনি কোন দেশের নাগরিকত্ব নেননি। এমনকি তখনকার পরিস্থিতিতে অনেক হায়দারাবাদী মুসলিম পাকিস্তানকে তাদের নতুন রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করলেও হামিদুল্লাহ তাও করেননি। নতুন মুসলিম পাকিস্তানের প্রতি তাঁর ভালবাসার কমতি ছিল না। কিন্তু হায়দারাবাদ ছিল তাঁর জন্মভূমি, তাঁর বিশ্বাস ও স্বকীয়তার প্রতীক। তাঁর হায়দারাবাদ সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ছিল না, ছিল তার বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির মতো উদার। শিক্ষা, সংস্কৃতি, বহুত্ব ও সহিষ্ণুতার এক তীর্থস্থান এবং মোগল সাম্রাজ্যের পর উপমহাদেশের প্রধান মুসলিম শক্তিকেন্দ্র।

মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ তাই ভারত কর্তৃক তার প্রিয় হায়দারাবাদের জবরদখল ও আগ্রাসনকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি বিশেষ করে হায়দারাবাদের ঐশ্বর্যময় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে যে নির্মমতার সাথে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তা তাঁর জন্য হজম করা ছিল সত্যিই কঠিন ও মর্মস্পর্শী ব্যাপার। (পাঁচ দিনের এই পরিকল্পিত দখল অভিযানে ভারতীয় বাহিনী দুই লক্ষের উপর নিরীহ হায়দারাবাদী মুসলমানকে হত্যা করে। এই অভিযানের মূল পরিকল্পক ছিলেন ভারতের তৎকালীন মুসলিম বিদ্বেষী উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই পাটেল)।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বক্তৃতা দিতে গিয়ে হায়দারাবাদের বিপর্যয়কে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত সেদিন বলেছিলেনঃ The march of the Indian troops on the capital of Hyderabad reminds me of the march of Italian troops towards the Abyssinian capital.[২]

যদিও সাম্রাজ্যবাদের মোড়লরা স্বাধীন হায়দারাবাদের জন্য এরপরে তেমন কিছুই করেনি। ভারতীয় আগ্রাসনের পরে নিরাপত্তা পরিষদে হায়দারাবাদকে নিয়ে যে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল তাও আর কখনো হয়নি। হায়দারাবাদের শেষ প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলী তাঁর দেশের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন ভারতীয় আগ্রাসনের পর তখনকার পরিস্থিতিতে সেই প্রতিনিধিদলের সদস্যরাও পিছু হটে আসেন ও গোপনে ভারতীয় এসট্যাবলিশমেন্টের সাথে বোঝাপড়া করে ফেলেন।

এই প্রতিনিধিদলের একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ যার কাছে হায়দারাবাদ কোন ভুলে যাওয়ার বিষয় ছিল না। আন্তর্জাতিক আইনের ছাত্র হিসেবে তিনি এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন যে, তাঁর দেশ এক অন্যায় আগ্রাসন ও জবরদখলের শিকার। তিনি কোন সরকারের সাথে যুক্ত ছিলেন না বা তাঁর তেমন কোন শক্তিও ছিল না। একজন বিনম্র জ্ঞানসাধক হিসেবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কূটক্যাচালও তিনি ভালভাবে বুঝতে পারেননি। তবুও ব্যক্তিগতভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত এই অবৈধ জবরদখলকে কখনোই স্বীকৃতি দেননি এবং তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রামও বাদ দেননি।

হায়দারাবাদ দখলের পর তিনি ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রিত হিসেবে থেকে যান এবং তাঁর ভাষায় তিনি কুফরিস্থানে (ভারত) আর কখনো ফিরে যাননি। তিনি সেখানে একটি মাসিক বুলেটিন বের করে হায়দারাবাদে ভারতের অবৈধ জবরদখল ও মুসলিম হত্যার প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের কাছে বুলেটিন পাঠিয়ে হায়দারাবাদ ইস্যুকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করেন এবং হায়দারাবাদ লিবারেশন সোসাইটি তৈরি করে কিছু আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করারও চেষ্টা চালান। বলা হয়ে থাকে এর সবকিছুই তিনি করেছিলেন নিজের পকেট থেকে এবং তাঁর টাইপরাইটারের সাহায্যে। এ কাজে হামিদুল্লাহ ছিলেন বরাবর একা। কেউ তাঁকে তেমন একটা সাহায্য করেনি এমনকি হায়দারাবাদের এলিটশ্রেণী যারা করাচীতে আশ্রয় নেন তাঁরাও এটিকে বাতিল বিষয় (Lost Case) হিসেবে গণ্য করেছিলেন।[৩]
কিন্তু হামিদুল্লাহ কোদালকে কোদালই বলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত অন্যায়কে অন্যায় বলেই জেনেছেন। হামিদুল্লাহকে জানতে হলে তাই হায়দারাবাদকে জানা চাই। হায়দারাবাদ ট্রাজেডীর মধ্যে তাঁর রক্তাক্ত আত্মা মুখ লুকিয়ে আছে। ভারতের জবরদখলের আগ পর্যন্ত হামিদুল্লাহ হায়দারাবাদের বিখ্যাত উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক আইনের অধ্যাপক হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ততদিনে তিনি ধীমান বুদ্ধিজীবী হিসেবেও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিশেষ করে মুসলিম আইন, সিরাত ও হাদিস শাস্ত্রে তাঁর বুদ্ধিজীবিতা ছিল ঈর্ষণীয়।

১৯০৮ সালে হায়দারাবাদ রাজ্যের শহর হায়দারাবাদের পুরনো এলাকা মুহাল্লা ফিলখানায় হামিদুল্লাহর জন্ম। তিন ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হামিদুল্লাহর আব্বা ছিলেন ঐ রাজ্যের সহকারী রাজস্ব সচিব। যাকে হায়দারাবাদের সরকারি পরিভাষায় বলা হতো মদদগার মুতামিদ মালগুজারী। শৈশবে পারিবারিক পরিবেশে তাঁর লেখাপড়ায় হাতেখড়ি। তারপর ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা তিনি পান হায়দারাবাদের বিখ্যাত দারুল উলুম মাদ্রাসা থেকে। এখান থেকে তিনি মৌলভী কামিল ও দরসে নিজামী ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৩০ সালে হামিদুল্লাহ উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক আইনে এম.এ. ও এলএলবি ডিগ্রি নেন, এরপরে ১৯৩৩ সালে জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.ফিল এবং ১৯৩৫ সালে প্যারিসের সোরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রি পান তিনি। ১৯৩৬ সালে দেশে ফিরে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে যোগ দেন ড. হামিদুল্লাহ।

দুই

> বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানচর্চার জগতে ড. হামিদুল্লাহ একালে ইসলামের সোনালী যুগের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং আল ফারাবী, আল গাজালী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাভাবনার ধারাকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। জ্ঞান সাধনায় একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বকোষসদৃশ পাণ্ডিত্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অবদান এই ঐতিহ্যের কয়েকটি গুনগত বৈশিষ্ট্য। ১৬৫টি গ্রন্থের রচিয়তা এবং প্রায় ১০০০টি গবেষণাপত্রের নিবন্ধকার হিসেবে ইসলামের জ্ঞানজগতের বিভিন্ন দিকের উপর তিনি আলোকপাত করেছেন। আইনের ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। খুব তরুণ বয়সে আইনবিদ হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং আইন বিষয়ের উপর লেখালেখি শুরু করেন। এসব লেখায় তাঁর যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণধর্মী মনের পরিচয় স্পষ্ট, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে ইসলামী উৎস থেকে পাওয়া প্রাসঙ্গিক কোন তথ্যকে তিনি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

যদিও ড. হামিদুল্লাহ জ্ঞানের ইসলামীকরণ জাতীয় অলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহার করেননি কিন্তু তাঁর লেখালেখি নীরবে এই চেতনাকে সমর্থন করে গেছে। আন্তর্জাতিক আইনের উপর তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে International Law: Its Principles and Precedents. ২৫০ পৃষ্ঠার এ ছোট বইটি কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের প্রচলিত ধারণার চর্বিত চর্বণ নয়। ইসলামী প্রেক্ষাপট থেকে দেখা আন্তর্জাতিক আইনের এক গভীর সমালোচনামূলক বই এটি। এর মাধ্যমে হামিদুল্লাহ সাহেব আন্তর্জাতিক আইনের একটি নতুন ভাষ্য রচনা করেন। এই বিষয়ে তাঁর অধিকার এবং প্রাথমিক কাজকর্ম পরবর্তীকালে তাঁকে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলা হয় সিয়ার, নিয়ে অধিকতর গবেষণায় আগ্রহী করে তোলে।

এক্ষেত্রে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে Neutrality in Islamic International Law । এটি তিনি জার্মান ভাষায় লিখেছিলেন এবং ১৯৩৩ সালে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিসারটেশন (Dissertation) হিসেবে জমা দেন। মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনে Laws of Neutrality নিয়ে এটি হচ্ছে প্রথম সুবিন্যস্ত ও মৌলিক রচনা। বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের কয়েকটি দিক এখানে এমনভাবে আলোচিত হয়েছে যা এতকাল ইসলামী ও পশ্চিমী দুনিয়ার কোথাও জানা ছিল না। দ্বিতীয়ত এ বই ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে ইসলামী রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একমাত্র দারুল ইসলাম ও

দারুল হরবের শ্রেণী বিভাজনকে ভুল প্রমাণ করেছে। তৃতীয়ত এ বইয়ে ইসলামী আইনে Concept of Neutrality'র একটি নতুন প্রত্যয় সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এবং সবশেষে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনে, আইনী ব্যাখ্যার সময় সমকালীন ঐতিহাসিক ধারণা ও প্রেক্ষাপটকে সামনে এনে মূল্যায়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে। সবদিক বিবেচনা করে বইটি মুসলিম আইনের উপর একালে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

সিয়ার শাস্ত্রে হামিদুল্লাহ সাহেবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছেঃ Muslim Diplomacy in the Time of the Prophet of Islam and His Orthodox Successors. এটি তিনি ফরাসী ভাষায় লেখেন এবং সোরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিসারটেশন হিসেবে ১৯৩৪ সালে জমা দেন। বইটির দুটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে তিনি রসূল (সঃ) ও তাঁর পুণ্য খলিফা চতুষ্টয়ের সাথে সমকালীন শাসক ও উপজাতীয় প্রধানদের সম্পর্কের কথা বলেছেন। সেদিক দিয়ে এ বইটি প্রথম যুগের ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রক্ষাপট সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছে।

দ্বিতীয় অংশে তিনি রসুল (সঃ) ও তাঁর চার খলিফার সময়ের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সাংবিধানিক দলিলগুলো সংযোজন করেছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে আহরণ করে এই মূল্যবান ও বিরল দলিলগুলো তিনি সমানুক্রম অনুসারে সাজিয়েছেন এবং ফরাসী ভাষায় তরজমা করেছেন। দ্বিতীয় অংশটি কয়েক বছর পর ড. হামিদুল্লাহ অন্যান্য অনেক দলিলপত্র সংযোজন করে আরো বর্ধিত আকারে বৈরুত থেকে আরবীতে পৃথকভাবে আল ওয়াতায়েক আল সিয়াসাহ নামে প্রকাশ করেন এবং এর বহু সংস্করণ বাজারে আসে। প্রাথমিক যুগের মুসলিম কূটনীতি সম্বন্ধে জানতে এ বইয়ের আজো বিকল্প নেই।

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে হামিদুল্লাহ সাহেবের ক্লাসিক গ্রন্থ হচ্ছে The Muslim Conduct of State. মূলতঃ উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতোকত্তর অভিসন্দর্ভ হিসেবে তিনি এটা জমা দেন এবং ১৯৪১ সালে লাহোর থেকে এটি প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তিনি মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের সব খুটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে নতুন বিশ্বপরিস্থিতি ও সমস্যার আলোকে বিশ শতকের প্রথম থেকেই মুসলিম চিন্তাবিদরা ইসলামী আইনের পুনর্গঠনের কথা ভেবে আসছিলেন। এ দিক দিয়ে ইকবাল ছিলেন অগ্রগণ্য। কিন্তু তিনি কিভাবে এটিকে পুনর্বিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন তা ঠিক এখন বোঝা না গেলেও, হামিদুল্লাহর The Muslim Conduct of State যদি তিনি দেখে যেতে পারতেন তবে এর মধ্যে হয়তো তাঁর স্বপ্নের কিছুটা বাস্তবায়ন দেখতে পেতেন।[8] হামিদুল্লাহ তাঁর Muslim Conduct of State লিখতে গিয়ে Oppenheim এর International Law কে আধুনিক মডেল হিসেবে ধরেছেন এবং এই বইয়ে আলোচিত আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণীবিভাগ ও নানা প্রশ্নসমূহ ইসলামী প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

ডঃ হামিদুল্লাহ পরিশ্রমী গবেষক। এই বইয়ের পাতায় পাতায় তাঁর নিষ্ঠা ও শ্রমের ছাপ রয়েছে। নানা ভাষার ও দেশের নানা তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন। তিনি শুধু ইসলামী আইন নিয়েই নাড়াচাড়া করেননি। ইতিহাস, দর্শন, নৌবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, জীবনচরিতও পর্যালোচনা করেছেন। বিশেষ করে কুরআন শরীফের বিভিন্ন তফসীর ও হাদীসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের নমুনা এ বইতে রয়েছে। ফিকাহর বিষয়বস্তু ছাড়াও ডঃ হামিদুল্লাহ মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনে নতুন বিষয়বস্তু ঢুকিয়েছেন। বিশেষ করে যেখানে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে সেখানে তিনি গতানুগতিক তথ্য ও ধারণার পাশাপাশি ফিকাহর ভিন্ন উৎস থেকে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া তিনি প্রচলিত বিষয়ের নতুন ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এই ভাবে এই বই হয়ে উঠেছিল বিপুল তথ্য সমৃদ্ধ এবং ইসলামী আইন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক।

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের উপর এ ধরনের বড় বড় কাজ করার পাশাপাশি তিনি অনেক বই নতুন করে সম্পাদনা করেছেন যা কিনা ইসলামের প্রাথমিক যুগের যুদ্ধকৌশল ও আন্তঃগোত্রীয় সম্পর্কের উপর আলো ফেলেছে। তিনি ইবনে ইসহাকের বিখ্যাত রসুল চরিত ও আল ওয়াকিদির কিতাব আল রিদ্দাও সম্পাদনা করেছেন। হামিদুল্লাহ সাহেব বিখ্যাত মদীনা সনদকে বলেছেন First Written Constitution of the World. এ শিরোনামে তিনি একটি পুস্তিকাও লেখেন এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি হাম্বলী আইনবিদ ইবন আল কাইয়েমের বিখ্যাত 'আহকাম আহলাল জিম্মা' বইটিরও সম্পাদনা করেন। ফিকাহ শাস্ত্রে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উপর এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ড. হামিদল্লাহকে আধুনিককালে তাই মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের নব নির্মাতা বলা যেতে পারে। যদি ইমাম মোহাম্মদ ইবন আল হাসান আল শায়বানীকে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের জনক বলা হয় তবে ড. হামিদুল্লাহকে আধুনিক মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের জনক বলতে হবে।

তিন

ড. হামিদুল্লাহর আর একটি প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল □সিরাহ□। মুসলিম দুনিয়ায় হযরত রসুল (সঃ)-এর জীবনকে কেন্দ্র করে যে বিপুল সাহিত্য রচিত হয়েছে ড. হামিদুল্লাহ আধুনিককালে তার সমৃদ্ধিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে তার আগ্রহের জন্ম যখন তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগের কূটনৈতিক পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন।

□সিরাহ□ বিষয়ে ড. হামিদুল্লাহর প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক বই হচ্ছেঃ The System of Government in the Time of the Prophet. মদীনাকে কেন্দ্র করে যে ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তিনি তাকে বলতেন City State of Madinah. আলোচ্য বইয়ে এই নগর রাষ্ট্রের বিচার ও সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বইটির বিষয়বস্তু চমৎকার। বিশেষ করে অতীতের সিরাহগুলোতে এই বিষয়ে কোন তথ্য না থাকার কারণে বইটির মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়ে ড. হামিদুল্লাহর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছেঃ The Political Life of Noble Messenger.

এরপরে ড. হামিদুল্লাহ লেখেন The Battle fields of Holy Prophet. বইটিতে রসুল (সঃ) তাঁর জীবনের শেষ আট বছরে যে লড়াইগুলো লড়েছিলেন তার স্থানগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৩০ এর দশকে ইউরোপ থেকে দেশে ফেরার সময় ড. হামিদুল্লাহ মক্কা, মদীনা ও তায়েফ সফর করেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের স্থানগুলো প্রাথমিক যুগের ইসলামী বইপত্র ঘেঁটে তথ্য সংগ্রহ করে সুচিহ্নিত করেন। বইটিতে যুদ্ধগুলোর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সিরাহ বিষয়ে ড. হামিদুল্লাহর সবচেয়ে মূল্যবান বইটি ফরাসী ভাষায় লেখা। এর নাম Le Prophet de L□Islam, যা ১৯৫৯ সালে প্রকাশ পায়। বইটির দুটি অংশ। প্রথমটিতে রসুলের জীবন, মিশন ও তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রসুলের বাণী ও শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বইটিতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে তখনকার আরবের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক নীতি ও পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং ইসলামের সাথে প্রাসঙ্গিক তখনকার দিনের আন্তঃরাষ্ট্র ও আন্তঃগোত্রীয় সম্পর্কের ধরণগুলো তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে রসুলের মিশনের সফলতার পিছনে বিভিন্ন গোত্রের ভূমিকা নিয়ে ড. হামিদুল্লাহর আলোচনা যেমন মৌলিক তেমন প্রতিভাদীপ্ত। এটা পাঠককে রসুল (সঃ)-এর বিভিন্ন সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর যৌক্তিকতা বুঝতে সাহায্য করবে। বিশেষ করে ড. হামিদুল্লাহ দেখিয়েছেন কিভাবে রসুল (সঃ) এক গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন, অন্যটির সাথে হননি। এটা পরবর্তীকালে ইসলামের বিকাশে সাহায্য করেছে। ড. হামিদুল্লাহর আগে পৃথিবী কেবল গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলো সম্বন্ধে অবগত ছিল। তিনিই প্রথম বুদ্ধিজীবী যিনি মক্কা ও মদীনার নগর রাষ্ট্রের কথা সবার সামনে তুলে ধরেছেন।[৫] তিনি এই দুটি নগর রাষ্ট্র সম্পর্কে বিপুল পরিমান বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন এ বইয়ে। বিশেষ করে মদীনা নগর রাষ্ট্রের সংবিধানের কথা বলেছেন, যা আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

চার

ড. হামিদুল্লাহর আগ্রহের আরো একটি বিষয় ছিল কুরআন, বিশেষ করে হাদীসের ঐতিহাসিকতা। ফরাসী ভাষায় তাঁর লিখিত রসুল চরিত এবং পরবর্তীকালে ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত তাঁর বই Emergence of Islam এ কুরআন সম্পাদনা ও গ্রন্থনার ঐতিহাসিক যথার্থতা নিয়ে তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

তিনি হাদিস সংগ্রহের ঐতিহাসিকতা ও যথার্থতা নিয়ে কাজ করেছেন। বিশেষ করে উনিশ শতকে ইউরোপের ওরিয়েন্টালিস্টরা হাদিস সংগ্রহের ঐতিহাসিকতা নিয়ে যে সন্দেহ পোষণ করেছেন তিনি তার যুক্তিসিদ্ধ জওয়াব দিয়েছেন। ওরিয়েন্টালিস্টরা সেকালে যেটা বলার চেষ্টা করেছেন তা হলো হাদিস সংগ্রহ ও সম্পাদনার ব্যাপারটা ঘটেছে তৃতীয় শতাব্দীতে এবং যেহেতু এই সম্পাদনার কাজটি মৌখিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে হয়েছে তাই তাদের ধারণায় এর মধ্যে ভুল বর্ণনা, বর্ণনার মধ্যে সংযোজন ও বিয়োজনের মত ঘটনা ঘটেছে। ওরিয়েন্টালিস্টরা সম্পূর্ণ অসদুদ্দেশ্যে এই মৌখিক বর্ণনার তত্ত্বকে এমন শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করেছে যে পূর্ব ও পশ্চিমের অনেক পাঠকই তাদের কথায় বিশ্বাস করে ফেলেছে।

ড. হামিদুল্লাহর ওস্তাদ মওলানা মানাজির আহসান গিলানী প্রথম এই বিষয়টি তাঁর প্রতিভাধর ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এই বিষয়ে কাজ করবার কথা বলেন। মরহুম মওলানা অনেক পরিশ্রম করে যাবতীয় তথ্য প্রমাণ উদ্ধার করে প্রমাণ করেছেন রসুল (সঃ)-এর পুণ্য সাহাবীরা লিখিতভাবে তাঁর কথা ও দৃষ্টান্তকে হেফাজত করেছিলেন। ওস্তাদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে ড. হামিদুল্লাহ এই বিষয়টি হাতে নেন এবং তাঁর সহজাত উদ্যম, মনীষা ও পরিশ্রমী সাধনার ফলে অচিরেই ফল ফলতে থাকে। ড. হামিদুল্লাহ তুরস্ক, জার্মানী ও ফরাসী দেশের কয়েকটি লাইব্রেরী থেকে হাদীসের কিছু প্রাচীন নমুনা সংগ্রহ করেন যা কিনা রসুল (সঃ)-এর সাহাবীদের দ্বারাই লিখিত হয়েছিল। এই আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে তিনি ওরিয়েন্টালিস্টদের মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ

করেন।

তিনি আরো উল্লেখযোগ্য প্রমাণসহ দাবি করেন শুধুমাত্র রসুলের সাহাবীরাই হাদিস লিখিতভাবে রক্ষা করেননি, স্বয়ং রসুল (সঃ)-এর নির্দেশেও লিখিতভাবে হেফাজত করা হয়েছিল। এইসব হাদীসের মধ্যে ৫২টি ধারা সংবলিত মদীনা সনদ এবং বিভিন্ন শাসক ও গোত্র প্রধানদের কাছে নানা রকম নির্দেশ ও পরামর্শ সংবলিত পাঠানো রসুলের চিঠিপত্রও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ড. হামিদুল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন সবচেয়ে মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য লিখিত হাদিস সংগ্রহগুলো হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস আবু রাফি, আনাস ইবনে মালিক, আমর ইবনে হাজম এবং আবু হুরায়রা কৃত। সর্বসাকুল্যে ড. হামিদুল্লাহ এ ধরনের ১৪টি প্রাচীন হাদিস গ্রন্থের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন।

পাঁচ

হায়দারাবাদ দখল যাওয়ার পর জীবনের বাকি ষাট বছর ড. হামিদুল্লাহ রিফিউজী হিসেবে প্যারিসে কাটিয়ে দেন। এখানে বসেই তিনি তাঁর মনন ও বিশ্বাসের চর্চা করে গেছেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি তাঁর বিশ্বাসকে কলুষিত হতে দেননি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন। প্যারিসের সাধারণ একটি ফ্লাটে থাকতেন। বাজার থেকে শুরু করে রান্না পর্যন্ত সবই নিজ হাতে করতেন। কামিজ, পায়জামা, মাথায় কারকুলি টুপি এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন পোষাক। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মনীষার সাথে ভদ্রতা, সৌজন্যতা ও বিনম্রতার এক অবিস্মরণীয় সমন্বয় ঘটেছিল। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবার সাথে তিনি একই রকমভাবে মিশতেন। এ সময় তাঁর ব্যবহারে কোন তারতম্য দেখা যেত না। এতবড় পণ্ডিত, দুনিয়া জোড়া যার খ্যাতি, কয়েকটি ভাষায় যিনি সমান দক্ষতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে লেখালেখি করেছেন এবং প্রায় ২০টি ভাষার উপর যার স্বচ্ছন্দ দখল ছিল তাঁর ভিতর ঘূর্ণাক্ষরেও অহমিকার মত মানবীয় দুর্বলতা প্রশ্রয় পায়নি। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন ফকীর, দা�য়ী ও ওয়ালিউল্লাহ।

প্যারিসের বিভিন্ন মসজিদে তিনি ইসলামের উপর বক্তৃতা দিতেন এবং অমুসলিমদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতেন। আমৃত্যু তিনি অমুসলিমদের সাথে ডায়ালগ ও সহাবস্থানের উপর জোর দিয়ে গেছেন। অমুসলিমদের কাছে ইসলামের বাণী সহজবোধ্য ভাষায় পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি ফরাসী ভাষায় কুরআনের তর্জমা করেন যা Le Coran নামে প্রকাশিত হয়। এই তর্জমা এত বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে প্রকাশের প্রথম বছরই ১ লাখ কপি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এটি পড়ে অসংখ্য অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করে।

ড. হামিদুল্লাহ বরাবরই আরবী ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিতেন। কারণ তিনি মনে করতেন আরবী হচ্ছে কুরআনের ভাষা। এটি ছাড়া ইসলামকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বিনম্র জ্ঞান সাধককে ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের হিজরা এডওয়ার্ড দেয়া হয়। এই পুরষ্কার তিনি গ্রহণ করেন, কিন্তু পুরষ্কারের বিপুল অর্থ তিনি ইসলামাবাদের ইসলামিক রিসার্স ইনস্টিটিউটে দান করে দেন। আর একবার তাঁকে বিখ্যাত ফয়সাল পুরষ্কার দেয়ার কথা উঠে। তাঁর শুভার্থীরা তাঁকে সৌদি আরবের ফয়সাল ফাউন্ডেশনে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দেয়ার অনুরোধ করে। এর উত্তরে তাঁর শুভার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি যা লেখেন তা কেবল একজন ওয়ালীউল্লাহর পক্ষেই সম্ভবঃ

> I fear that if I were to accept any worldly reward for my modest work, I may not get my due in the hereafter and be left with only my sins in my book of deeds and, therefore, I keep telling everyone I don�t want these awards.[৬]

প্যারিসে অবস্থান করলেও ড. হামিদুল্লাহর মন পড়ে ছিল মুসলিম উম্মাহর সাথেই। মুসলিম দুনিয়ার কোন আমন্ত্রণ পেলেই বা কোন সংকটে তাঁর ডাক পড়লেই তিনি সেখানে ছুটে যেতেন। ১৯৪৯ সালে তিনি করাচী যান এবং বছর খানেক অবস্থান করেন। এখানে তখন পাকিস্তানের সব মতের উলামা ও ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা মিলিত হয়ে সংবিধানের যে খসড়া তৈরি করেছিলেন তিনি তাঁর পরাপর্শক হিসেবে এসেছিলেন, যা পরবর্তীকালে Basic Principles of an Islamic State হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

তিনি কিছদিন মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ইলাহিয়াৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন। এ ছাড়া তিনি দা�য়ী হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে চলা মুসলিম স্বাধিকার আন্দোলনগুলো নিয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল প্রচুর। ড. হামিদুল্লাহ ছিলেন ইকবালের সেই কবিতার দরবেশের মত

যাকে পূর্ব কিংবা পশ্চিমের শৃঙ্খল দিয়ে আবদ্ধ করা যায় না। তিনি ছিলেন একালে ইসলামের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত। ২০০২ সালের ১৭ ডিসেম্বর এই বিনম্র ফকীর ও জীবন সাধক ইন্তেকাল করেন।

ছয়

ড. হামিদুল্লাহর উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব ও মনীষা তাঁর চিন্তাভাবনার একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। আজকাল অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিত্বমূলক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উত্তম রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করেছেন। কিন্তু ড. হামিদুল্লাহ democracy-কে demo(n)cracy বলে মনে করতেন।[৭] কারণ তাঁর ধারণা ছিল গণতন্ত্রে অধিকাংশের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হয় ও বাকী ৪৯% এর অধিকার অস্বীকৃত হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি ইসলামের নীতি প্রয়োগ করে সকলের অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পারস্পারিক সহাবস্থান সম্ভব বলে মনে করতেন। ইসলামের ইতিহাস এর বড় নজির। এক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বাদশাহ কিংবা অন্য যে কেউ এ নীতি প্রয়োগ করতে পারে। ইসলামের ক্ষেত্রে দেখার ব্যাপার হচ্ছে নীতির যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা। ড. হামিদুল্লাহর এসব চিন্তার সাথে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু তাঁর চিন্তার যথার্থতা হালকা বলে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই।

ড. হামিদুল্লাহ পারিবারিকভাবে শাফেঈ ধারার অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বভাবজাত উদারতা তাঁকে এই সব মাযহাবের উর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল। মাযহাব, তরীকা ও ফিরকার নীতি দ্বারা তিনি কখনোই ইসলামকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেননি। ইসলামের প্রয়োজনে তিনি সকল মাযহাবের আইনের উৎসগুলো ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। হানাফী, হাম্বলী, মালেকী এমনকী শিয়া আইনগুলো নিয়েও তিনি নির্বিবাদে কাজ করেছেন। এসব বিষয়ে তাঁর মধ্যে কোন সংকীর্ণতা কাজ করেনি। তিনি মনে করতেন ইসলামের উদারতার নীতিকে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। সংকীর্ণতা দিয়ে ইসলামের হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

গ্রন্থঋণঃ

[১] "The Last Citizen of Hyderabad, M H Faruqi" In Impact International, Vol 33: No 1, 2 and 3, January-March, 2003.
[২]. প্রাগুক্ত।
[৩]. প্রাগুক্ত।
[৪] "Sirah, Hadith and Law: Almost a Century of Scholarship, Dr. Mahmood Ahmed Ghazi "In Impact International", Vol 33: No 1, 2 and 3 January-March, 2003.
[৫] প্রাগুক্ত।
[৬] "Story of King Faisal Prize: In the event, escaped embarrassment, Syed Faiyazuddin Ahmed" in Impact International, Vol 33: No 1, 2 and 3, Janualry-March, 2003.
[৭] "Confessions and Conversation: Poet, Politican and Polymath, Sadida Athaullah" in Impact International, Vol 33: No 1, 2 and 3 January-March, 2003.

সূত্রঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "উত্তর আধুনিক মুসলিম মন" গ্রন্থ

ফাহমিদ-উর-রহমান

ফাহমিদ-উর-রহমান একজন মননশীল প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন। সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন বিধায় তিনি আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। আধুনিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। তার ঋদ্ধ লেখালেখি নতুন আঙ্গিকে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার উপরে আলোকপাত করেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নামঃ ১। ইকবাল মননে অন্বেষণে (১৯৯৫) ২। অন্য আলোয় দেখা (২০০২) ৩। উত্তর আধুনিকতা (২০০৬) ৪। সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা (২০০৮) ৫। উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (২০১০) ৬। সাম্রাজ্যবাদ (২০১২) ৭। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ (২০১৩) ৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ (২০১৪) পাশাপাশি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১। জামাল উদ্দীন আফগানী: নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ (২০০৩) ২। মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি (২০১১)